IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

নারী প্রগতির বিশ্বস্ত দলিল : ‘হাজার চুরাশির মা’

ঘনশ্যাম রায়

‘হাজার চুরাশির মা’ মহাশ্বেতা দেবীর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। বিশ শতকের সাত-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। এই উপন্যাসের পরতে পরতে উঠে এসেছে নারী প্রগতির কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ। নারী প্রগতি বর্তমান কালের একটি বহুচর্চিত বিষয়। ‘প্রগতি’ শব্দটি মূলত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত; রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে যারা প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন করে নতুন মতবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রতত্ত্বের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী হন, তাঁদেরকেই মূলত প্রগতিবাদী বলা হয়। উনিশ শতকে নবজাগরণের পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠা এবং পুরুষতান্ত্রিকতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে নারীর যে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, তা নারী প্রগতিরই নামান্তর।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী ও পুরুষ একজন আর একজনের সঙ্গী হিসাবে জীবন-তরণী চালনা করে আসছে। অথচ নারী-পুররুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই বিশ শতকেও মতভেদ ও অনিশ্চয়তার অন্ত নেই। সামাজিক ভাবে নারী ও পুরুষ কিভাবে অগ্রসর হলে মানব জাতির শান্তিময় প্রগতি সম্ভব ও সহজ হয়- তার সুষ্ট ধারণা এখনও যেন আমাদের বোধের বাইরে। এই সুষ্ট বোধের অভাবে একদিকে যেমন স্বাধীনতার নামে নারীকে প্রদর্শনীর বস্তু করা হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে সতীত্ব রক্ষার নামে নারীকে করা হচ্ছে পঙ্গু ও অবরুদ্ধ। প্রকৃত অর্থে আমরা নারীকে না দিয়েছি শিক্ষা, না দিয়েছি প্রকৃত স্বাধীনতা। এমনকি কখনো কখনো আমাদের সমাজ নারীকে একটি নিকৃষ্ট জীব কিংবা পদসেবিকায় পরিণত করতেই অভ্যস্ত থেকেছে।। আধুনিক কালেও আমরা দেখছি নারীকে সর্বদা যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না বরং অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত প্রগতির নামে নারীকে ভোগের বা খেলার সামগ্রি করে পাপের পথ পরিষ্কার করা হচ্ছে। এতদিন ঘরের ভিতরে বেঁধে রেখে নারীকে অন্ধ করা হয়েছে, আর এখন তথাকথিত প্রগতির চোখ ঝলসানো তীব্র আলোকে তার চোখকে আরও বেশি করে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

জগতে শুধু নারী বা নর একাকী জীবন ধারণ ও সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে না। নারী বা নরের জীবন এমন মধুর ও পবিত্র সম্পর্কে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একজনের প্রতি আর একজনের বিদ্রোহ মানব জাতির অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে। তাই শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই নর-নারীর মিলনে এবং সহজীবন ধারণে এই ভিন্নতাই নর বা নারীর জীবনে অপার আনন্দ ও সুখ বহন করে আনে। তাই নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় কথা হ’ল একজনের উপর আর একজনের পরস্পর নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতা অসহায় দুর্বলের নির্ভরশীলতা মাত্র নয়; এর মূল কথা হ’ল একজনের অভাব অন্যের সাহায্যে পূরণ করে নেওয়ার স্পৃহা। এই নির্ভরশীলতা ছাড়া সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং এই নির্ভরশীলতার অভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে মানবীয় গুণের কোনোটিরই পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সুযোগ থাকে না।

‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসটিতে নকশালবাড়ী আন্দোলনের সূত্রে বিশ শতকের সাত-এর দশকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। এই সাত-এর দশককে বলা হয়েছিল ‘মুক্তির দশক’। এই

দশকে হাজার চুরাশি হয়েছে সেই ব্রতী, জন্মাবার আগে যাকে তার মা সুজাতা চট্টোপাধ্যায় মনেপ্রাণে ব্যাকুলচিত্তে কামনা করেছিলেন। ব্রতীর হাজার চুরাশী হওয়ার পর মর্গে সংখ্যার হিসাবে তার লাশ দেখতে গিয়েছিলেন তার মা সুজাতা চট্টোপাধ্যায়-- যার স্বামী দিব্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন পাঁড় লম্পট। তিনি চিরকাল বাইরে মেয়েদের নিয়ে নোংরামি করেছেন। সুজাতার শাশুড়ী তাঁর এই পুত্রের ও সুজাতার অন্য ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবার নানা অপকর্ম সম্পর্কে জানার পরও সেটিকে সমর্থন করেছে 'পৌরুষের প্রকাশ' হিসেবে। সুজাতার মেয়ে নীপাও বাবা দিব্যনাথের মতো বহুগামী হলেও তা দিব্যি মেনে নিচ্ছে নীপার স্বামী। আবার সুজাতার আর এক মেয়ে তুলির বিয়ে হচ্ছে টোনি কাপাডিয়ার সঙ্গে-- যার মা মিসেস কাপাডিয়া একজন গুরুবাদী মহিলা। স্বামী বা গুরুর কথাকেই তিনি জগতের সমস্ত সংকটের একমাত্র সমাধান বলে মনে করেন। আর জাতের সমস্যা দূর করতে গিয়ে তুলি-টোনির বাগদান অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তিনি বলেছিলেন যে, কেউ নিজের জাতি ও ভাষার মানুষকে বিয়ে করতে না পারলেই নাকি জাতের সমাস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তুলি ও টোনির বাগদান পার্টিতে তাই ব্রতীর কথা উঠলে তাকে বলা হয়েছে 'মিসগাইডেড'। অবশ্য, আমরাও এই সময়ের জঙ্গিদের বলেছি 'মিসগাইডেড'। কেন তারা জঙ্গি হ'ল তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে কয়েকটি হ'ল পরিবারের শিথিল বন্ধন, মা-বাবার দাম্পত্য সংকট, আশেপাশের মানুষের নৈতিক অধঃপতন ইত্যাদি ঘটনাবলী। 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে ব্রতীর পরিবারের দশাও হয়েছিল ঠিক তাই; তথাকথিত নারী প্রগতির তীব্র আলোকে ঝলসানো।

কিন্তু মুক্তির দশকে ব্রতী কেন উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে উঠল বা ব্রতী কেন হত্যা করে আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুকে পড়ল এই উপন্যাসে তার কিছু উত্তরের আভাস আমরা এই উপন্যাসে পাই। উপন্যাসের এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে একটা বিশ্বাস সেই সময়ে ব্রতীদের অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই ব্রতীরা বুঝতে পারেনি যে-ব্যবস্থার সঙ্গে ওদের যুদ্ধ, সে-ব্যবস্থা জন্মের আগেই বহুজনকে এরকমভাবে ভ্রুণেই বিষাক্ত করে দিয়েছিল। তাই এই উপন্যাসে ব্রতীর সঙ্গে ব্রতীর তুলনায় একেবারে হতদরিদ্র ঘরের ছেলে সমুদের কথা এসেছে। একই পার্টির ছেলে হিসাবে, নিজের পার্টির ভেতরকার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে কয়েকজন তরুণ বিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছে। তাদের চারজনের নাম খবরের কাগজে ছাপা হয়, কিন্তু অবস্থাপন্ন ও বড়লোকের ঘরের সন্তান হওয়ার জন্য ব্রতীর নাম তার বাবা দিব্যনাথ খবরের কাগজে ছাপা হতে রুখে দিয়েছেন। অবশ্য এজন্য তাকে যথেষ্ট ছোটাছুটি করতে হয়েছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সুজাতার বকলমে মহাশ্বেতা দেবী সমকালীন শ্রেণি আধিপত্যের দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে ব্রতীর মৃত্যুকে একটা বেদনার চাদরে মুড়ে তার মা সুজাতাকে আমরা দিনযাপন করতে দেখি। তিনি একদিকে প্রবল কর্তৃত্ববাদী, অন্যদিকে লম্পট স্বামীর বিপরীতে নিজের প্রতিবাদ নিজের মতো করে জারি রেখেছিলেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে একমাত্র ব্রতীই ছিল এই প্রতিবাদের সঙ্গী। এই ব্রতী সংস্কৃতি চর্চা করতো, কবিতার কাগজ বের করতো; সে নন্দিনী নামে একটি মেয়েকেও ভালবাসত-- যে নন্দিনী নিজেই একজন নকশালপন্থী। ব্রতীরা 'খতমের লাইনে' কেন চলে গিয়েছিল? কেন তাকে নিশ্চিন্ত আরামের জীবন টানলো না? কেন সে তার শ্রেণি থেকে অনেক নীচে থাকা আরও কিছু তরুণের সঙ্গে ভিরে গিয়ে সমাজ বদলের সশস্ত্র পথ বেছে নিল?-- মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সুজাতার মাধ্যমে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে আমাদের সামনে যে সমাজের ছবি আমাদের সামনে হাজির করেছেন সেই সমাজটা ভেতরে ভেতরে সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়েছে, গলে পচে পুতিগন্ধময় হয়ে গেছে; বাইরে এর চক চকে ভাব থাকলেও ভেতরে ভেতরে এই সমাজ ভয়াবহ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। তাই সুজাতা বার বার এই ভয়াবহ সমাজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনন্য চিন্তায় বিশ্বস্ত থেকেছেন।

সুজাতা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত বড় ও রুচিশীল ঘরের মেয়ে। তাঁর বাবা তাঁকে লরেটোয় পড়িয়েছেন এবং বি. এ. পাশ করিয়েছেন শুধু এই ভেবে যে এর ফলে সম্পন্ন ঘরে সুজাতার বিয়ে দিতে বিশেষ সুবিধা হবে। তাই সুজাতার বাবা বড় ঘরের ছেলে দিব্যনাথের অবস্থা খারাপ জেনেও তার সঙ্গে সুজাতার বিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, এই দিব্যনাথ একদিন অনেক ওপরে উঠবেন। আর সুজাতাও তাঁর স্বামীর বাড়ির স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়িতে সুজাতার অবস্থান ছিল নেহাতই অনুগত, অনুগামী, নীরব ও অস্তিত্বহীন একজন নাগরিকের মত। তাদের পরিবারে শুধু দিব্যনাথ ও তাঁর মা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতেন এবং সেখানে সুজাতার অবস্থান ছিল একপ্রকার মূল্যহীনের মতো। তাঁর শাশুড়ী

যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সুজাতার নিজের একখানা কাপড়ও নিজের শখে কিনবার অধিকার ছিল না; দিব্যনাথেরও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করার অধিকার বা রুচি ছিল না।

দিব্যনাথের অফিসে যখন টালমাটাল অবস্থা চলছিল তখন সুজাতা পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন লাঘব করার জন্য ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দেন। ব্রতীর বয়স তখন সবে তিন বছর। অবশ্য সুজাতা ব্যাঙ্কের কাজটা পেয়েছিলেন তাঁর বংশকৌলিন্যের জোরে-- অভিজাত চেহারা ও বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণের জোরে। তিনি যখন কাজে বেরিয়ে যেতেন তখন তিন বছরের ব্রতী তাঁর হাঁটু জরিয়ে ধরে কান্নাকাটি করে তাকে অফিসে যেতে নিষেধ করেছে; সবসময় তার কাছে থাকার বায়না করেছে। এজন্য দিব্যনাথও তাঁকে বার বার বলেছিল চাকরি ছেড়ে দিতে। কিন্তু সুজাতা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই সন্তানের প্রতি সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেও ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়েন নি। এই কাজ না-ছড়াটা সুজাতার দ্বিতীয় বিদ্রোহ; প্রথম বিদ্রোহটা তিনি শুরু করেছিলেন ব্রতীর দু'বছর বয়স তখন থেকেই। যার জন্য দিব্যনাথ তাকে কিছুতেই পঞ্চমবার 'মা' হতে বাধ্য করতে পারেন নি। একা ব্রতীর জন্য সুজাতা স্বামীকে, শাশুড়ীকে অমান্য করেছেন। অর্থহীন শাসন আর স্বেচ্ছাচারী প্রশ্রয়, যা তার অন্য সন্তানেরা ভোগ করেছে, তা ব্রতীকে তিনি ভোগ করতে দেন নি। তার অন্য সন্তানদের তার শাশুড়ী সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ব্রতীর ক্ষেত্রে সুজাতা সেই দখল ছাড়েন নি। বরং অত্যন্ত জেদি, অনুভূতিপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ ব্রতীকে সুজাতা অনেকটা ছায়া ও মায়ায় বড় করে তুলেছিলেন। তাই ব্রতীর প্রতি সুজাতার দুর্বলতা লক্ষ্য করে দিব্যনাথ ব্রতীকে মনে করতো 'মাদার্স চাইল্ড'। অন্যদিকে ব্রতীও তার বাবাকে তার নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে শ্রেণি শত্রুদের একজন মনে করত। সাত-এর দশকের নব্য তরুণ ব্রতী মনে করত, যে-পথ ধরে সমাজ ও রাষ্ট্র চলছে, সে পথে মুক্তি আসবে না। তাই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারানো ব্রতী সমাজ পরিবর্তনের নেশায় নিজেকে সেসময়ে আমূল বদলে ফেলেছিল। এই বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা সুজাতা লক্ষ্য করলেও তখন ঠিকমত তা বুঝে উঠতে পারেন নি। কিন্তু ব্রতীর মৃত্যুর পর তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্রতীর নিজের হাতে লেখা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বয়ান দেখার পর সুজাতা নারীর স্বভাব-সুলভ সুখী গৃহকোণের বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং পরিচিত হলেন মুক্তির দশকের এক অগ্নিগর্ভ সামাজিক অবস্থার সঙ্গে।

ব্রতীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সুজাতা সাত-এর দশকের অগ্নিগর্ভ আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি পরিচিত হন সমুর মা ও দিদির সঙ্গে। সমুর পিতা ও সমুর মৃত্যুর পর সমুর দিদিকেও অনোন্যোপায় হয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছেলে পড়িয়ে সংসার চালাতে হতো। সমুর মায়ের কাছ থেকে সুজাতা জানতে পেরেছিলেন লাল্টু, বিজিত ও পার্থর কথা; প্রভূত সামর্থ ও সম্ভাবনা থাকলেও এরা একসময় কাজ কাজ করে পাগলের মতো ঘুরে বেরিয়েছে কিন্তু একটা কাজও কোথাও পায় নি। সমাজে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু লাভ করতে না পেরে এরা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এরা চেয়েছিল সামাজিক মুক্তি, ব্যক্তির মুক্তি। তাই তারা গোপনে সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে। সমুর মায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে সুজাতা প্রথম জানতে পারেন যে, যেদিন ব্রতী হাজার চুরাশি হয়, সেদিন ব্রতী সমুদের বাড়িতে এসেছিল সমুদের সাবধান করতে এবং তা করতে এসেই তার প্রাণটা গেছে। সমুর মা সমু ও ব্রতীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি একদা ব্রতীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন- "তুমি কেন এমন কইরা হকল জলাঞ্জলি দিতেছ ধন! কি নাই তোমার? সভাউজ্জুল বাপ, বিদ্বান মা।" [১] আসলে ব্রতী ও সমুদের আন্দোলন যে সফল হওয়ার নয়, তা সমুর মা যেন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ব্রতীকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রতী কি করে বদলে গেল সুজাতা ব্রতীর মৃত্যুর আগে তা অনুধাবন করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ব্রতীর মৃত্যুর কারণ খুঁজতে এসে সুজাতা এই শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজের ভেতরের রাজনীতির কথা জানতে পারেন। এই ব্রতী ছিল শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজের ভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি। ব্রতী ধনী পরিবারের ছেলে। কিন্তু তার মায়ের প্রতি তার বাবার আচরণ ও সামন্ততান্ত্রিক ঔদ্ধত্য ব্রতীকে শ্রেণি সচেতন হতে উদ্‌বেজিত করেছিল। তাই সে সমু-বিজিত-পার্থ-লাল্টুদের দলে তার ভিরে গেছে। ওদের জীবন-সংগ্রাম ব্রতীকে কেমন যেন নাড়িয়ে দেয়। জীবনই তাকে বদলে যেতে বাধ্য করে। সমুর মতো দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তান, লাল্টুর মতো ভাগ্যপীড়িত অপমানিত যুবকদের এবং সমকালীন মানুষদের জীবনের জ্বালা নিজের রক্তমাংসে অনুভব করেই মুক্তির দশকে ব্রতী হাজার চুরাশি হ'ল। নতুবা জীবনে বেঁচে থাকলে ব্রতীও হয়তো বিলেত যেত, বিরাট চাকরি করত কিংবা সমাজের ওপর তলায় বিনা বাধায় উঠে যেতে পারত ।

ব্রতী যে মেয়েটিকে ভালোবাসত তার নাম নন্দিনী। সেও ছিল মুক্তির দশকে তথাকথিত উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী ও ব্রতীর সহযোগী। সুজাতা নন্দিনীর কাছ থেকে জানতে পারেন ব্রতীদের সঙ্গে অনিন্দ্যর বিট্রে করার কথা। অনিন্দ্য যদি বিট্রে না করত তাহলে হয়তো ব্রতীকে 'হাজার চুরাশি' হতে হত না। নন্দিনীর কথাতেই সুজাতা জানতে পারেন জেলে জেলে পাঁচিল উচু হওয়ার কথা, জেলে ওয়াচ টাওয়ার বসানোর কথা, ধরপাকড় ও জেলে গুলি চালানোর কথা। ব্রতীর হাজার চুরাশী হওয়ার পরবর্তীকালে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এভাবেই মুক্তির দশকের প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সুজাতা চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিতি ঘটে এবং তিনি একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হন।

তথ্যসূত্রঃ

১। দেবী, মহাশ্বেতা- হাজার চুরাশির মা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পৃ. ৩৬

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। দেবী, মহাশ্বেতা- হাজার চুরাশির মা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯

২। মণ্ডল, শুভেন্দু- প্রতিরোধের উপস্থাপন, মহাশ্বেতা দেবী এবং মামণি রয়ছম গোস্বামী, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯